History (PG) Second Sem.
Paper – 202

ভারত ছাড়ো আন্দোলনের বিস্তৃতি ও আঞ্চলিক বিন্যাস

রীনা পাল

ভারত ছাড়ো আন্দোলন প্রথমে শুরু হয় বোম্বাই, আমেদাবাদ, পুণা, দিল্লি, এলাহাবাদ, কানপুর, লক্ষ্ণৌ, কলকাতা, পাটনা, ঢাকার মতো বড় শহরে। পরে এই আন্দোলন ভারতের বিস্তৃত অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। সভা, সমিতি, শোভাযাত্রা এবং হরতালের মাধ্যমে সাধারণ জনগণ প্রতিবাদ জানিয়েছিল। বোম্বাইয়ের বিশাল জনসভায় শ্রীমতী অরুণা আসফ আলি জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। এই স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনেমহিলা ও ছাত্রসমাজ নেতৃত্ব দেয়। ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে মানুষের ক্ষোভ নানাভাবে প্রকাশ পায়। মিটিং-মিছিল, বয়কট-হরতাল ছাড়াও স্কুল-কলেজ বর্জন, থানা, ডাকঘর, আদালত আক্রমণ, টেলিফোন ও রেলসংযোগ বিচ্ছিন্ন করা, ট্রাম-বাস পোড়ানো, পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়া ইত্যাদি উপায়ে জনগণ তাদের ক্ষোভ প্রকাশ করে। বোম্বাই ও পুণায় আন্দোলন হিংস্র রূপ নিলে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ তীব্র আকার ধারণ করে। পুলিশের গুলিতে বহু মানুষের প্রাণ যায় ও আহত হয়। পুণায় পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে উঠলে সেখানে চারদিন ধরে সেনাবাহিনী মোতায়েন রাখতে হয়। দিল্লিতেও জনতার সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষে বহু মানুষ মারা যায়। সরকার সংবাদ-পত্রের কণ্ঠরোধ করে তার নির্মম দমন-পীনড়ন চাপা দেওয়ার চেষ্টা করে। আন্দোলন চলাকালীন 'ন্যাশনাল হেরাল্ড' ও 'হরিজন'-এর প্রকাশনা বন্ধ করে দেওয়া হয়। ভারত প্রতিরক্ষা আইনের বলে সরকার কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করলে ভারতের নানা প্রান্তে স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে ওঠে। পুলিশের নির্দেশ অমান্য করে সত্যাগ্রহীরা জোর করে সরকারি ভবনগুলির উপর জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে গ্রেপ্তার হন। বহু স্থানে হাজার হাজার মানুষ একজোট হয়ে রেল লাইন উপড়ে ফেলে, সেতু ভেঙ্গে দেয় এবং টেলিফোন লাইন কেটে দেয়। দক্ষিণ ভারতে দীর্ঘ ১৩০ মাইল রেললাইন উপড়ে ফেলা হয়। আগস্ট আন্দোলনের প্রথম পর্বেই শ্রমিকরা ধর্মঘটে সামিল হয়েছিল। আমেদাবাদ, বোম্বাই, জামশেদপুর ও পুণার শ্রমিকরা সক্রিয়ভাবে ধর্মঘটে সামিল হয়েছিল।

আগস্ট আন্দোলন তীব্র আকার ধার করেছিল বিহার ও উত্তরপ্রদেশের পূর্বাঞ্চলে। ভারত ছাড়ো আন্দোলন এই সব স্থানে প্রায় বিদ্রোহের রূপ নিয়েছিল। বিহারে জাতীয় নেতাদের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে জামশেদপুর, ঝরিয়া ও কাতরার হাজার হাজার শ্রমিক কর্মবিরতি পালন করে। জামশেদপুরের শ্রমিকরা টানা ১৩ দিন ধরে ধর্মঘট বজায় রেখেছিল। বিহারে ভারত ছাড়ো আন্দোলনের তীব্রতা ও বিস্তৃতি অন্য সব প্রদেশকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল। এই প্রদেশের

প্রায় ৮০ শতাংশ জনতার নিয়ন্ত্রণে চলে গিয়েছিল। ১১ই আগস্ট মুঙ্গেল, ভাগলপুর, শারণ, মুজঃফরপুর, পূর্ণিমা ও সাঁওতাল পরগণায় জাতীয় পাতাকা উত্তোলন করা হয়। ঐদিন পাটনা মহাকরণে জাতীয় পতাকা উত্তোলনকে কেন্দ্র করে পাটনার ছাত্রদের সঙ্গে সামরিক বাহিনীর সংঘর্ষ হয় এবং সাতজন ছাত্র মারা যায়। এই ঘটনার প্রতিবাদে আন্দোলন হিংসাত্মক রূপ নেয়। রেল লাইন উপরে ফেলে, সেতু ভেঙে দিয়ে এবং টেলিফোন ও টেলিগ্রাফের তার ছিঁড়ে ফেলে জনগণ তাঁদের ক্ষোভ প্রকাশ করে। মোকামা ও বক্তিয়ারপুরে পুলিশ থানায় আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়। হাজারিবাগ, ভাগলপুর ও ভোজপুর অঞ্চলে বিদ্রোহ তীব্র আকার ধারণ করেছিল। উত্তর ভাগলপুরে জনতা একটি জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করে। বিহারের ত্রিহুত ডিভিশনে দুসপ্তাহ ধরে কার্যত কোনো সরকারি নিয়ন্ত্রণ ছিল না, দেশের বাকি অংশ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। বিহারে আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন স্বয়ং জয়প্রকাশ নারায়ণ, তিনি ডাঃ কার্ত্তিক প্রসাদ, শ্যামসুন্দর প্রসাদ, ডাঃ বৈদ্যনাথ ঝা প্রমুখ নেতাদের নিয়ে নেপালের তরাই অঞ্চলে যান এবং সেখানকার বৈপ্লবিক কর্মকান্ডে লিপ্ত হন। ফ্রান্সিস হাচিন্স তাঁর 'Sponteneous Revolution " The Quit India Movement' গ্রন্থে যুক্তপ্রদেশ ও বিহারে ভারত ছাড়ো আন্দোলনের গণবিদ্রোহের রূপকে তুলে ধরেছেন। প্রথম পর্যায়ে ছাত্র ও যুব সম্প্রদায়ের নেতৃত্বে যে আন্দোলনের সূচনা হয় ব্রিটিশ দমননীতির ফলে তাদের হাত ধরেই সেই আন্দোলন গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিল। কারণ ব্রিটিশ সরকার ব্যাপক ধরপাকড় শুরু করলে এইসব ছাত্র-যুবনেতারা গ্রামাঞ্চলে আশ্রয় নেন। এইসব নেতারা স্থানীয় ও প্রাদেশিক নেতৃবৃন্দ (যারা ব্রিটিশ সরকারের গ্রেপ্তার এড়াতে পেরেছিলেন) তারা ভারত ছাড়ো আন্দোলনকে সকলের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন।

বালিয়া, আজমগড়, বস্তি, গাজীপুর, মীর্জাপুর, ফৈজাবাদ, সুলতানপুর, বেনারস, জৌনপুর, গোরক্ষপুর যুক্তপ্রদেশের পূর্বদিকের এই জেলাগুলিতে আগস্ট আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করেছিল। যুক্তপ্রদেশের পূর্বাঞ্চলের সাধারণ মানুষ স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল নানা কারণে। প্রথমত অস্বাভাবিক দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি এখানকার দরিদ্র মানুষদের জীবন বিপর্যস্ত করেছিল। দ্বিতীয়ত বিহার ও পূর্ব যুক্তপ্রদেশ থেকেই বেশি শ্রমিক দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায়ও বিশ্বের অন্যান্য প্রান্তে গিয়েছিল এবং শ্বেতাঙ্গ শাসকদের অন্যায় বৈষম্যের শিকার হয়েছিল। ব্রিটিশ প্রশাসন তাদের কোনো সাহায্য না করে জাপানি সেনাদের হাতে ছেড়ে দিয়েছিল। বার্মা যুদ্ধ ফেরৎ আহত সৈনিকরা যে অসহনীয় পরিস্থিতিতে ট্রেন ভর্তি করে দেশে ফিরেছিল তা

তাদের স্বাভাবিকভাবে ব্রিটিশ বিরোধী করে তুলেছিল। তাই আগস্ট আন্দোলন এখানে চরম মাত্রা লাভ করে। অধ্যাপক সুমিত সরকার তাই লিখেছেন, "It is probably not accidental that east U.P. and west and north Bihar-the region where the 'August Rebellion' attacined its maximum popular intensity was also traditionally one of the principal catchment areas for Indian migrant labour going to South East Asia and the other parts of the world." তৃতীয়ত পূর্ব উত্তরপ্রদেশের লাগোয়া পশ্চিম ও উত্তর বিহার অঞ্চল আগস্ট আন্দোলনের কেন্দ্রভূমি হওয়ায় তার প্রভাব ঐ অঞ্চলে পড়ে। সর্বোপরি বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থান খুব কাছে হওয়ায় সেখানকার ছাত্রদের দ্বারা প্রচারিত গান্ধিজির বাণী (করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে) সাধারণ মানুষকে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে যোগ দিতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। বালিয়া জেলা ভারত ছাড়ো আন্দোলনের এক প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। এখানে চিতু পান্ডের নেতৃত্বে একটি জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, যদিও তা বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। গাজীপুরেও সরকারি প্রশাসন অকেজো করে দিয়ে জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। আজমগড় ও বেনারসেও ভারত ছাড়ো আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করে। নিবলটের ডায়েরি থেকে জানা যায় বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররাই আজমগড়ে প্রথম আক্রমণ শুরু করে। মধুবনে ৫ হাজার মানুষের বিশাল মিছিল থানা দখলের চেষ্টা করলে পুলিশের গুলিতে ৩০ জনের মৃত্যু হয়। সরকারের আগ্নেয়াস্ত্রের মোকাবিলা তারা ইট, লাঠি ও তলোয়ারের মাধ্যমে করে। বেনারসে আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন ডাঃ কে.এন. গৈরোলা ও অধ্যাপক রাধেশ্যাম। এখানে ছাত্ররা মুখ্য ভূমিকা পালন করে। জাতীয় পতাকা উত্তোলন থেকে শুরু করে, টেলিগ্রাফ ও টেলিফোনের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা ও রেললাইন অবরোধ ও অন্যান্য নাশকতামূলক কাজ করে তাদের ক্ষোভ প্রকাশ করে। যুক্তপ্রদেশের মুসলিমরা আগস্ট আন্দোলন বেশি আগ্রহ না দেখালেও এই আন্দোলন কানপুর, লক্ষ্ণৌ, মীরাট, মোরাদাবাদ প্রভৃতি স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। সরকারি হিসেব থেকে জানা যায় যে, নেতাদের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদ স্বরূপ প্রথম সপ্তাহেই ২৫০ টি রেলস্টেশন ক্ষতিগ্রস্ত বা ধ্বংস করা হয় এবং ৫০০টি ডাকঘর ও ১৫০টি থানা আক্রান্ত হয়।

বিহার ও যুক্তপ্রদেশের মতো বাংলায় ভারত ছাড়ো আন্দোলন এতটা তীব্রতালাভ না করলেও বাংলার বিভিন্ন স্থানে সরকার বিরোধী কার্যকলাপ ও আন্দোলন দীর্ঘদিন ধরে চলেছিল। বাংলায় ভারত ছাড়ো আন্দোলন প্রধান কলকাতা, ঢাকা মেদিনীপুর, হুগলী, বর্ধমান, বীরভূম ও দিনাজপুর জলপাইগুড়ি জেলায় কেন্দ্রীভূত ছিল। কলকাতায় ছাত্ররা ক্লাস বয়কট করে মিটিং-

মিছিল, পথসভা ও পথ অবরোধের মাধ্যমে আন্দোলনের সূচনা করে। তারা থানা ও ট্রাম-বাসে আগুন লাগিয়ে তাদের ক্ষোভ প্রকাশ করে। সরকারি সূত্র থেকে জানা যায়, ১৩ থেকে ১৫ই আগস্টের মধ্যে পুলিশের গুলি চালনায় ৩৯ জনের মৃত্যু হয়। ঢাকায় সরকারি অফিসগুলি আক্রান্ত হয়। আন্দোলনের ঢেউ পূর্ববঙ্গের অন্যান্য জেলাগুলিতে আছড়ে পড়ে। ফরিদপুর, বরিশাল, ময়মনসিংহ, যশোহর ও খুলনায় ধর্মঘট পালিত হয়। উত্তরবঙ্গে রাজবংশীরা, বীরভূমে সাঁওতালরা, পুরুলিয়ায় নিম্নবর্ণের মানুষরা আন্দোলনে যোগ দেয়। তবে ভারত ছাড়ো আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করেছিল মেদিনীপুর জেলায়। তমলুক ও কাঁথি ছিল আন্দোলনের প্রধান ঘাঁটি। এখানে আন্দোলনকারীরা থানা দখল, টেলিগ্রাফ ও ডাকঘর ধ্বংস ও রাস্তাঘাট ধ্বংসের মতো নাশকতামূলক কাজে লিপ্ত হয়। ২০ হাজার মানুষের বিশাল মিছিল তমলুক থানা দখল করতে এলে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। পুলিশের গুলিতে ৭৩ বছরের বৃদ্ধা মাতঙ্গিনী হাজরা শহীদ হন। মৃত্যুকালেও তিনি তাঁর হাতে জাতীয় পতাকা ধরে রেখেছিলেন। তমলুক মহকুমায় বিদ্রোহী জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠা করে সমান্তরাল প্রশাসন চলেছিল। এই মহকুমায় সুতাহাটা, মহিষাদল, নন্দীগ্রাম, খেজুরি প্রভৃতি স্থানের সাধারণ মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে আগস্ট বিপ্লবে যোগ দিয়েছিল। মেদিনীপুরের অবস্থা বর্ণনা করে ফজলুল হক বাংলার বিধান সভায় মন্তব্য করেন ঃ "There was something like a network of parallel administration set up in Midnapore. There was a direct challenge to the Government authority which was conducted on an organised basis unknown at any rate in this province." স্বেচ্ছাসেবকরা এবং জাতীয় সরকারের কর্মীরা ডাকঘর, রাস্তা, টেলিগ্রাফের তার ধ্বংস করে। ব্রিটিশ সরকারের সমান্তরাল জাতীয় সরকারের সর্বোচ্চ ছিলেন একজন সর্বাধিনায়ক যিনি স্বরাষ্ট্র, প্রতিরক্ষা, রাজস্ব, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিচার ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরের জন্য মন্ত্রী নিয়োগ করতেন। এই সমান্তরাল সরকার হিটলারের Storm-Troopers আদলে 'বিদ্যুৎ বাহিনী' নামে স্বেচ্ছাসেবী দল গড়ে তুলেছিল। মহিলা স্বেচ্ছাসেবিকাদের নিয়ে 'ভগিনী সেনা' গড়ে উঠেছিল। কাঁথি মহকুমার পটাশপুর অঞ্চলে আন্দোলনকারীরা নিজেরা প্রশাসন পরিচালনার জন্য জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও থানা শাসক নিয়োগ করেছিলেন। তমলুকের প্রবীণ কংগ্রেস নেতা সতীশ চন্দ্র সামন্ত তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকারের সর্বাধিনায়ক নিযুক্ত হয়েছিলেন। অজয় কুমার মুখোপাধ্যায় এবং সুশীল কুমার ধাড়া যথাক্রমে অর্থ ও স্বরাষ্ট্র দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। সতীশচন্দ্র সামন্ত গ্রেপ্তার হলে অজয় কুমার মুখোপাধ্যায় তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকারের সর্বাধিনায়ক নিযুক্ত হন। জমিদার, সম্পন্ন জোতদার ও মজুতদারদের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করে জাতীয় সরকার বন্যা-দুর্গতদের ত্রাণ কার্যে ব্যয়

করেছিল এবং স্কুলগুলিকেও আর্থিক সাহায্য দান করেছিল। ধনী জোতদারদের উদ্বৃত্ত ধান-চাল সংগ্রহ করে তা গরীব মানুষের মধ্যে বন্টন করে এই সরকার জনপ্রিয়তা লাভ করে। সরকারি দমন-পীড়ন সত্ত্বেও ১৯৪৪ সালের সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত এই জাতীয় সরকার তার অস্তিত্ব বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছিল। ২১ মাস কাজ চালানোর পর গান্ধিজির অনুরোধে তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার ১৯৪৪–এর ২৯ শে সেপ্টেম্বর তার স্বাধীন কাজকর্ম বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। মেদিনীপুরের এগরা থানা অঞ্চলেও আগস্ট আন্দোলন জোরদার হয়ে উঠেছিল। এখানে বসন্ত কুমার দাসের নেতৃত্বে বৈপ্লবিক কাজকর্ম চলেছিল। নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগর, নবদ্বীপ, কৃষ্ণনগর, নবদ্বীপ, রাণাঘাট, শান্তিপুর, মাজদিয়া, করিমপুর, হুগলি জেলার চুঁচুড়া, শ্রীরামপুর, কোন্নগর, আরামবাগ, পুরুলিয়া জেলার বান্দোয়ান, পটন্দা ও পুরুলিয়া শহর, বীরভূম জেলার রামপুরহাট, মল্লারহাট, দুবরাজপুর, বোলপুর ও কোপাই, দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট, বর্ধমান জেলার বর্ধমান শহর ভারত ছাড়ো আন্দোলনের কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। নদীয়া জেলায় কংগ্রেস সোসালিস্ট পার্টি, বিপ্লবী কমিউনিস্ট পার্টি ও ফরওয়ার্ড ব্লক সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিল। কৃষ্ণনগর, মাজদিয়া, আরামবাগ ও বর্ধমানে ভারত ছাড়ো আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন যথাক্রমে সনৎ কুমার মুখোপাধ্যায়, মন্মথ রায়, দুর্গাদাস কোলে এবং বিজন কুমার ভট্টাচার্য।

উড়িষ্যায় ভারতছাড়ো আন্দোলনের কেন্দ্রস্থল ছিল বালেশ্বর, কটক, কোরাপুট ও তালচের। ছাত্রদের মুখ্য ভূমিকার জন্য সরকারি প্রতিবেদনে এই রাজ্যের গণ আন্দোলনকে "পুরোপুরি ছাত্র বিদ্রোহ" বলে বর্ণনা করা হয়েছে। বাংলার মতো এখানেও আন্দোলনকারীরা থানা দখলের চেষ্টা করে, যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন করে এবং সরকারি সম্পত্তি ধ্বংস করে। বালেশ্বর জেলায় লবণের গোলা লুঠ করা হয় এবং বিভিন্ন স্থানে যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন করা হয়। এই জেলার বহু গ্রামে স্বরাজ পঞ্চায়েত গড়ে উঠেছিল। বিদ্রোহীরা ইরাম বাসুদেবপুর তানা আক্রমণ করলে পুলিশের গুলিতে ৩৫ জনের মৃত্যু হয়। কটকে 'রক্ত বাহিনী' গড়ে তোলা হয়েছিল। কোরাপুটে উপজাতি কৃষকরা লক্ষ্মণ নায়কের নেতৃত্বে জাপুরের রাজার সংরক্ষিত অরণ্য ধ্বংস করে। তারা জমিদারের বিরুদ্ধে কর বয়কট আন্দোলন, অরণ্য সত্যাগ্রহ সংগঠিত করেন। তালচেরে বিদ্রোহীরা গোরিলা পদ্ধতিতে আন্দোলন চালিয়ে যান। মধ্যপ্রদেশে আগস্ট আন্দোলন কেন্দ্রীভূত হয়েছিল নাগপুর, ওয়ার্ধা, বান্ডা, অমরাবতী, বেতুল, চন্দ্রাপুর প্রভৃতি স্থানে। এখানে আন্দোলনকারীরা সরকারি কোষাগার লুণ্ঠন করেছিল, বড় ডাকঘরে আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল এবং বিভিন্ন স্থানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়েছিল। অমরাবতী জেলায় আন্দোলন জোরদার হয়ে উঠেছিল। এখানকার হনুমান ব্যায়াম মন্ডল নাশকতামূলক কাজের

সঙ্গে যুক্ত ছিল। মহারাষ্ট্রের সাঁতারা জেলা দীর্ঘস্থায়ী বিকল্প জাতীয় সরকার স্থাপন করে সকলের নজর কেড়েছিল। এখানে 'ন্যায়দান মণ্ডল' ও 'পতি সরকার' গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। গান্ধিজির অনুরোধ সত্ত্বেও এই সরকার আত্মসমর্পণ করেনি। ব্রিটিশ দমন-পীড়ন সহ্য করেও তারা ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে গিয়েছিল। সেনাবিহনীর ব্যাপক উপস্থিতির কারণে আসামে আগস্ট আন্দোলন তেমন জোরদার হয়ে উঠতে পারেনি। তবুও তেজপুর, গোয়ালপাড়া, বরপেতা, শিবসাগর, লখিমপুর, ঢেকাইজুলি প্রভৃতি স্থানে আন্দোলনকারীদের সাথে পুলিশের সংঘর্ষ হয়।

'কংগ্রেসের আধ্যাত্মিক নিবাস' গুজরাটে আগস্ট আন্দোলন সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল। ডেভিড হার্ডিম্যান তাঁর 'The Quit India Movement in Gujrat' শীর্ষক প্রবন্ধে দেখিয়েছেন যে আগস্ট আন্দোলন এখানে কম নাটকীয় হলেও দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল এবং সুসংগঠিত ছিল। বল্লভভাই প্যাটেল লিখেছেন "In western India, Quit Indian movement was less dramatic than in Bihar or U.P. but it lasted far longer ... The movement in this part of India was, on the whole, better organised than elsewhere." স্বয়ং প্যাটেল এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন। তাঁর সুযোগ্য নেতৃত্বে আমেদাবাদ, বরোদা, সুরাট ও খেদা কংগ্রেসের শক্তিশালী ঘাঁটি হিসেবে কাজ করেছিল। আগস্ট আন্দোলনে সাড়া দিয়ে আমেদাবাদের সুতোকলের শ্রমিকরা ধর্মঘট করে। আমেদাবাদে ছাত্ররা হরতাল করলে ও থানায় আগুন লাগালে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। এই ঘটনায় অনুপ্রাণিত হয়ে বরোদার স্কুল কলেজের ছাত্ররা ধর্মঘট ডাকে। কারখানার শ্রমিকরাও এই ধর্মঘটে যোগ দেয়। আন্দোলন দ্রুত ভাবনগর রাজকোট, পোরবন্দর, জামনগর প্রভৃতি শহরে ছড়িয়ে পড়ে। গুজরাটের বণিক শ্রেণিও আগস্ট আন্দোলনে সমর্থন যুগিয়ে এসেছিল। আন্দোলনকারীদের সামাজিক গঠন বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে আমেদাবাদ ও বরোদায় মূলত উচ্চবংশজাত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণি আন্দোলনে অংশ নিয়েছিল। এরা ছিলেন প্রধানত পটিডার সম্প্রদায় ও অনাবিল ব্রাহ্মণ শ্রেণি। তাই এখানে রাজস্ব বা খাজনা বয়কট আন্দোলন সংগঠিত হয়নি। ব্রোচ জেলায় থানা আক্রমণ, সুরাট ও বরোদায় নাশকতামূলক ঘটনা ঘটলেও এবং সরকারি সম্পত্তি আক্রান্ত হলেও গরিব কৃষকরা খাজনা দেওয়া বন্ধ করেনি। আন্দোলনের প্রধান ধারা এরকম হলেও কিছু স্থানে আদিবাসীরাও আন্দোলনে সামিল হয় এবং উচ্চশ্রেণির নেতৃত্বকে উপেক্ষা করে কিষাণ সভায় যোগ দেয়।

'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের প্রকৃতি ও তাৎপর্য

ভারত ছাড়ো আন্দোলন বিশাল গণ আন্দোলনে পরিমত হলেও তা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ

হয়। ব্রিটিশ সরকার কঠোর দমন-পীড়ন চালিয়ে ছয়-সাত সপ্তাহের মধ্যেই তা দমিয়ে দেয়। আসলে আন্দোলন যতই জনপ্রিয় হোক না কেন সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে নেতৃত্বহীন নিরস্ত্র মানুষের সংগ্রাম দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে না। এই আন্দোলন দমিত হলেও ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে তা এক উজ্জ্বল অধ্যায় হিসেবে রয়ে গেছে। এই আন্দোলনে ব্রিটিশ রাজের অপরাজেয় ভাবমূর্তি ভেঙে গিয়েছিল। কোনো কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব ছাড়া দেশের সকল শ্রেণির মানুষ যে স্বতঃস্ফূর্ততায় আন্দোলনে অংশ নিয়েছিল তা ছিল এককথায় নজির-বিহীন। ১৯৪৩-এর শেষে প্রায় ৯২ হাজার মানুষ বন্দি হয়েছিল। এর আগে ব্রিটিশ বিরোধীতায় এবং ব্রিটিশ শাসন থেকে মুক্তির জন্য দেশের মানুষকে এমন মরণপণ সংগ্রাম করতে দেখা যায়নি। তাই বড়লাট লিনলিথগো ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিলকে ভারত ছাড়ো আন্দোলন সম্পর্কে টেলিগ্রামে জানান, "by far the most serious rebellion since that of 1857"। ব্রিটিশ শাসনের অবসানের লক্ষ্যে এই আন্দোলন এতটাই তীব্র আকার ধারণ করেছিল যে ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠীর বুঝতে অসুবিধা হয়নি যে ভারতে তাদের দিন ফুরিয়ে আসছে। ব্রিটিশ শাসনের অবসান এবং ভারতের স্বাধীনতা এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা। তাই এই দিক থেকে ভারত ছাড়ো আন্দোলনকে স্বাধীন ভারতের সূচনাকারী আখ্যা দিলে ভুল হবে না। বাস্তবেও তাই হয়, আগস্ট আন্দোলনের পরে ব্রিটিশ সরকার ভারতীয়দের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রক্রিয়া শুরু করে। তাই ড: বরুণ দে মন্তব্য করেন যে, একদিক থেকে ভারত ছাড়ো আন্দোলন ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামের চূড়ান্ত পর্যায়ের সূচনা করেছিল ("In one sense the Revolt of 1942 marked the culmination of the Indian Freedom Movement")।

জওহরলাল নেহেরু তাঁর "Discovery of India" গ্রন্থে এই আন্দোলনকে "impromptu freenzy of the mob" আখ্যা দিয়েছেন। ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দের ভারত ছাড়ো আন্দোলন প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন, "It was essentially a sponteneous mass upheaval"। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের মহাবিদ্রোহের সঙ্গে তুলনা করে এই আন্দোলন প্রসঙ্গে তিনি আরও লিখেছেন, "নেতা নেই, সংগঠন নেই, উদ্যোগ আয়োজন কিছুই নেই, কোন মন্ত্রবল নেই অথচ একটা অসহায় জাতি স্বতঃস্ফূর্তভাবে কর্মপ্রচেষ্টার আর কোনো পন্থা না পেয়ে বিদ্রোহী হয়ে উঠলো — এই দৃশ্য প্রকৃতই বিস্ময়ের ব্যাপার।" সুগত বোস ও আয়েষা জালালও ভারত ছাড়ো আন্দোলনকে ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের মহাবিদ্রোহের পর ভারতের সব থেকে বড় অসামরিক অভ্যুত্থান আখ্যা দিয়েছেন। তাঁদের ভাষায় "Inspired by Gandhi's slogan 'do a die', the Quit India movement turned out to be the biggest civilian uprising in India since the great rebellion of 1857"।

ছাত্র ও শ্রমিকদের নেতৃত্বে একটি শহুরে আন্দোলন হিসেবে এর সূচনা হলেও ক্রমে তা গ্রামাঞ্চলে সাধারণ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। সাধারণ মানুষ ও কৃষক শ্রেণি থানা, ডাকঘর, রাজস্ব দপ্তর, রেল স্টশনের মতো ব্রিটিশ কর্তৃত্বের স্মার চিহ্নগুলিকে আক্রমণ করে। বিহার, পূর্ব উত্তরপ্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ, উড়িষ্যা ও বোম্বাই-এর সাঁতারা জেলায় ব্রিটিশ প্রশাসন কার্যত লোপ পায় এবং তার বদলে এই সব স্থানে সমান্তরাল সরকার গড়ে ওঠে।

জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম সারির সব নেতাকে গ্রেপ্তারের পরিপ্রেক্ষিতে যে অভূতপূর্ব গণরোষের বহিঃপ্রকাশ ঘটে তাকে এফ.জি. হাচিনস্ (F.G. Hutchins)–এর মতো আধুনিক ঐতিহাসিকেরা "স্বতঃস্ফূর্ত বিপ্লব" (Spontaneous revolution) রূপে বর্ণনা করেছেন, কারণ "কোনো পূর্বপরিকল্পিত কর্মসূচি এমন তাৎক্ষণিক ও সর্বব্যাপী পরিণাম সৃষ্টি করতে পারত না" ("no preconceived plan could have produced such instantaneous and uniform results")। অধ্যাপক অমলেশ ত্রিপাঠী তাঁর "স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস" (১৮৮৫–১৯৪৭) শীর্ষক গ্রন্থে লিখেছেন "...অনেক জায়গায় আন্দোলন স্বতঃস্ফূর্ত ছিল – জনতাই নেতা"। তবে সাম্প্রতিক কালে ভারত ছাড়ো আন্দোলনের ইতিহাস বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে এই আন্দোলন "শুধু প্রস্তুতিহীন জনগণের আবেগপ্রবণ সাড়ামাত্র ছিল না" যদিও এই আন্দোলনের নজিরবিহীন হিংসাত্মক ঘটনা কংগ্রেসের পূর্বপরিকল্পিত ছিল না যা সরকার দাবি করেছিল। তবে গত দুই দশক ধরে কংগ্রেস সোসালিস্ট পার্টি, অল ইণ্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস (AITUC), সর্বভারতীয় কিষাণ সভা এবং ফরওয়ার্ড ব্লকের মতো কংগ্রেসের সহযোগী সংগঠনগুলির নেতৃত্বে যে উগ্র গণ আন্দোলনগুলি পরিচালিত হচ্ছিল তা এই ধরণের মহাবিস্ফোরণের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিল। ভারত ছাড়ো আন্দোলন সম্পর্কে সাধারণভাবে 'স্বতঃস্ফূর্ত' বিশেষণটি ব্যবহার করা হয়, কারণ এই আন্দোলন শুরু হবার আগেই গান্ধিসহ সব প্রথম সারির নেতাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। আগের দুটি আন্দোলনের ক্ষেত্রে তা হয়নি, গান্ধিজি নিজেই সেই আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। আন্দোলনের গতিধারার উপর তাঁর প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ ছিল, আন্দোলন হিংসাত্মক হয়ে ওঠার সাথে সাথেই তিনি তাকে বন্ধ করে দেন। কিন্তু 'ভারত ছাড়ো আন্দোলন' শুরু করার আগে তাঁর অন্য ধরনের মানসিক প্রস্তুতি ছিল। ক্রিপস্ মিশনের ব্যর্থতার পর তিনি বুঝেছিলেন বড় গণ আন্দোলন সংগঠিত না করলে ইংরেজরা স্বেচ্ছায় ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করবে না। তাছাড়া দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার জাপানের সামরিক সাফল্য দেখে তিনি ভেবেছিলেন মিত্রপক্ষের পরাজয় অনিবার্য। এই পরিস্থিতিতেও যখন বড়লাট ও ভারত সচিব তাঁর সঙ্গে আপোষ করতে রাজি হলেন না তখন তিনি ভারতের স্বাধীনতার জন্য

মরীয়া হয়ে ওঠেন। তিনি বলেন এটাই তাঁর জীবনের সবচাইতে বড় সংগ্রাম, শেষ সংগ্রাম। তিনি এর শেষ দেখে ছাড়বেন। তাই তিনি "করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে" (Do or Die) -এর ডাক দেন। ৮ই আগস্ট বোম্বাইয়ে এ.আই.সি.সি.-র বৈঠকে ভারত ছাড়ো আন্দোলনের প্রস্তাব গৃহীত হলে তিনি দেশবাসীর কাছে আবেদন জানান, "আমার বিশ্বাস গোটা ভারতবর্ষ আজ অহিংসা আন্দোলন শুরু করবে।" কিন্তু তার সঙ্গে একথাও জানান যে যদি জনগণ অহিংসার পথ থেকে সরে আসে, "আমি সরে যাব না। আমি পিছিয়ে আসব না।" গান্ধিজির দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্লেষণ করে শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, "১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে অহিংসার প্রশ্নটির গুরুত্ব বোধ হয় কমে গিয়েছিল, তুলনায় গুরুত্ব বেড়েছিল "করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে"-র আহ্বান অথবা জাতির মুক্তির স্বার্থে চূড়ান্ত আত্মত্যাগ করার আমন্ত্রণের।"

আগস্ট আন্দোলন শুরু হবার আগে কংগ্রেস নেতৃত্ব যে ১২ দফার কর্মসূচি সম্বলিত খসড়া প্রস্তাব রচনা করে তাতে স্বাভাবিক গান্ধিবাদী কর্মসূচি (যেমন সত্যাগ্রহ স্কুল-কলেজ, অফিস-আদালত বয়কট এবং প্রয়োজনে কর বন্ধ ইত্যাদি) ছাড়াও রেল স্টেশন আক্রমণ, টেলিগ্রাফ লাইন বিচ্ছিন্ন করা, কর পরিশোধ না করা এবং সমান্তরাল সরকার প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি কর্মসূচি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। এই কর্মসূচির একাধিক তর্জমা কংগ্রেস কর্মীদের মধ্যে বিলি করা হয়েছিল। এর সঙ্গে অন্ধ্রপ্রদেশ কংগ্রেস কমিটির তৈরি করা খসড়াটিও ছিল। তবে বাস্তবে আন্দোলন যে ভয়াবহ রূপ নিয়েছিল বিশেষ করে যে স্বতঃস্ফূর্ত গণ অভ্যুত্থান দেখা দিয়েছিল তার জন্য কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব প্রস্তুত ছিল না। অধ্যাপক সুমিত সরকার বলেছেন যে এমন কি ভারত ছাড়ো প্রস্তাবেও আসন্ন আন্দোলনের খুঁটিনাটির ব্যাপারে যথেষ্ট অস্পষ্টতা ছিল। তিনি লিখেছেন, "It needs to be emphasized that even the 'Quit India' resolution was remarkably vague about the details of the coming movement। আরও আলাপ আলোচনার অবকাশ ছিল। কিন্তু ব্রিটিশ সরকারের অনমনীয় মনোভাব এবং ব্যাপক দমন-পীড়ন গণ-বিস্ফোরণের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকেই ব্রিটিশ আমলাতন্ত্র ১৯৩২–এর আদলে কংগ্রেসের উপর ব্যাপক নগ্ন আক্রমণের ছক কষেছিল। তাই আপোষের পথ ত্যাগ করে তারা সংঘর্ষের পথ বেছে নিয়েছিলেন। আগস্ট বিপ্লবের জন্য সরকার কংগ্রেসকে দায়ী করলেও তাদের অসহযোগিতাও কম দায়ী ছিল না। সুমিত সরকার লিখেছেন বহু চেষ্টা করেও ব্রিটিশ সরকার প্রমাণ করতে পারেনি যে ৯-ই আগস্টের আগেই কংগ্রেস হিংসাত্মক বিদ্রোহের পরিকল্পনা করেছিল ("Despite streneous efforts the British failed to establish their case that the Congress a before I August had really planned violent

rebellion")। টোটেনহ্যাম (Tottenham) প্রতিবেদনে অন্ধ্রপ্রদেশ কংগ্রেস কমিটির ২৯ শে জুলাই, ১৯৪২ তারিখের যে গোপন সার্কুলারের উল্লেখ রয়েছে তাতে কংগ্রেস কর্মীদের প্রতি স্পষ্ট নির্দেশ ছিল তারা যেন প্রস্তুত থাকে, সংগঠিত থাকে এবং সতর্ক থাকে, কিন্তু যতক্ষণ না গান্ধিজি সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন ততক্ষণ কোনোরকম সক্রিয়তা না দেখায় ("be ready, organise at once, be alert, but by no means act ... till Mahatmaji decides")। কংগ্রেসের নির্দেশিকায় অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের মতো কর্মসূচি-ই অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল, যেমন স্কুল-কলেজ, আদালত ও সরকারি চাকরি বর্জন, বিদেশী পণ্য বয়কট ইত্যাদি। আর বলা হয়েছিল জমিদাররা যদি আন্দোলনে যোগ না দেয় তবেই কর বন্ধ করতে। শ্রমিক ধর্মঘটের ব্যবস্থা করতে বলা হয়েছে। এছাড়া শুধু চেন টেনে ট্রেন বন্ধ করতে নিষেধ করা হয়নি অথবা উৎসাহিত করা হয়নি এবং টেলিফোন ও টেলিগ্রাফ লাইন কেটে দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। কংগ্রেসের এই চরম নির্দেশিকার সত্যতা মনে নিয়েও বলা যায় যে ৯ই আগস্টের পর গণ বিস্ফোরণের তীব্রতা এর চেয়ে অনেক বেশি ছিল এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের প্রতীকী প্রতিষ্ঠানগুলির উপর আক্রমণ ভয়ানক হিংস্র হয়েছিল। তাই আধুনিক গবেষকগণ এ বিষয়ে প্রায় সকলেই একমত যে ভারত ছাড়ো আন্দোলনের স্বতঃস্ফূর্ততা আগের আন্দোলনগুলির সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করেছিল। কিন্তু আঞ্চলিক দিক থেকে এই আন্দোলন বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে সেখানে কেন্দ্রীয় নির্দেশের চেয়ে সেখানকার আঞ্চলিক পরিস্থিতি ও প্রেক্ষাপট আন্দোলনের গতিকে প্রভাবিত করেছিল এবং আন্দোলনের স্বতঃস্ফূর্ততার চেয়ে প্রস্তুতির বড় ভূমিকা ছিল। আর তাছাড়া স্বতঃস্ফূর্ততার প্রকাশ দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে না, আন্দোলনের নির্দিষ্ট কর্মসূচি অনুযায়ী তাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হয়।

প্রথমদিকে (৯ থেকে ১১ই আগস্ট) জাতীয় ও প্রাদেশিক নেতারা গ্রেপ্তার হওয়ায় আন্দোলনের হাল অপেক্ষাকৃত অপরিচিত নেতা ও ছাত্রদের হাতে ছিল এবং গণরোষের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ ঘটেছিল। তবুও একথা ভুললে চলবে না যে ঐরকম ঐতিহাসিক মুহূর্তে গান্ধিজি ও জাতীয় কংগ্রেসের প্রশ্নাতীত প্রতীকী বৈধতা ছিল। সব কিছুই গান্ধিজি ও কংগ্রেসের নামে ঘটেছিল। কিন্তু সংগঠন হিসেবে কংগ্রেসের এবং ব্যক্তি হিসেবে গান্ধিজির এই সব ঘটনাবলির উপর কোনো নিয়ন্ত্রণ ছিল না। জ্ঞানেন্দ্র পান্ডে যথার্থই বলেছেন গান্ধিজি হলেন সেই আন্দোলনের অবিসংবাদিত নেতা যার উপরে তাঁর প্রায় কোনো কর্তৃত্বই ছিল না ("the undisputed leader of a movement over which he had little command")। গান্ধিজির

নামে এই আন্দোলন পরিচালিত হলেও আন্দোলনের রাশ চলে গিয়েছিল সাধারণ মানুষের হাতে। আন্দোলন আঞ্চলিক রূপ নেওয়ায় স্থানীয় স্তরে এমন অনেকে এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন যারা ছিলেন প্রাতিষ্ঠানিক রাজনীতির বাইরের মানুষ। তাই অনেক ক্ষেত্রেই এই আন্দোলন প্রথাগত কংগ্রেসি ভাবধারাকে অতিক্রম করে অনেক বেশি র‍্যাডিক্যাল হয়ে উঠেছিল। আন্দোলনের প্রধান কেন্দ্রগুলিতে থানা, ডাকঘর, রেলস্টেশন এবং অন্যান্যসরকারি প্রতিষ্ঠান আক্রমণ, রেল লাইন উপড়ে ফেলা, টেলিফোন, টেলিগ্রাফের লাইন কেটে ফেলা, সরকারের অনুগত পুলিশ কর্মচারী ও গুপ্তচরদের উপর আক্রমণের ঘটনা ঘটে। এই আন্দোলনের একটি লক্ষ্যণীয় দিক হল মধ্যবিত্ত ছাত্রদের নেতৃত্বদান যা আইন অমান্য আন্দোলনের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায়নি। মহিলারাও বিশাল সংখ্যায় এই আন্দোলন যোগ দিয়েছিল, কারণ মিত্র বাহিনীতে সেনাদের হাতে বহু ধর্ষন, যৌন নিগ্রহের ও শ্লীলতাহানির ঘটনা ঘটে। ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী ও শ্বেতাঙ্গদের বিরুদ্ধে জমা ক্ষোভের প্রকাশ এইভাবে ঘটেছিল।

সুমিত সরকার ভারত ছাড়ো আন্দোলনের তিনটি পর্যায় উল্লেখ করেছেন। প্রথম পর্যায়ে আন্দোলন শহরাঞ্চলে সীমাবদ্ধ ছিল। এই পর্যায়ে আন্দোলন বয়কট, পিকেটিং ও ধর্মঘটের মাধ্যমে ব্যাপক ও হিংসাত্মক রূপ নিলেও সরকার শীঘ্র তা দমন করে। ৯ই আগস্ট থেকে ১৪ই আগস্ট পর্যন্ত বোম্বাই ছিল এই আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্র। কলকাতায় ১০ থেকে ১৭ই আগস্ট পর্যন্ত হরতাল পালিত হয় এবং দিল্লিতেও হিংসাত্মক সংঘর্ষে অনেকের প্রাণ যায়। পাটনায় দুদিন ধরে কার্যত কোনো সরকারি নিয়ন্ত্রণ ছিল না। আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হয় আগস্টের মাঝামাঝি সময়ে। এই সময় আন্দোলনের ভরকেন্দ্র শহর থেকে গ্রামের দিকে সরে যায়। বেনারস, পাটনা, কটক প্রভৃতি কেন্দ্র থেকে জঙ্গি ছাত্ররা যোগাযোগ ব্যবস্থা যেমন রেলপথ, স্টেশন, টেলিফোন, টেলিগ্রাফ ইত্যাদি এবং সরকারি বিল্ডিং ধ্বংস করে। এর সঙ্গে যোগ হয় ব্যাপক কৃষক বিদ্রোহ যা ১৮৫৭-র মহাবিদ্রোহের কথা মনে করিয়ে দেয়। এই পর্যায়ে আন্দোলনের প্রধান কেন্দ্রগুলি হল বিহার ও পূর্ব যুক্ত প্রদেশ, বাংলার মেদিনীপুর এবং মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক ও উড়িষ্যার কিছু অঞ্চল। এই সময় বিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন জায়গায় "জাতীয় সরকার" গড়ে তোলা হয়। সরকার আন্দোলন দমন করার জন্য নৃশংস আক্রমণ চালালে আন্দোলনকারীরা বাধ্য হয়ে গোপনে আন্দোলন চালিয়ে যায়। সেপ্টেম্বরের শেষ থেকে আন্দোলনের এই দীর্ঘতম ও ভয়ঙ্কর পর্যায় শুরু হয়। এই সময় যে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ চলে তার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল যোগাযোগ ব্যবস্থাকে এবং মেলা ও পুলিশ প্রযুক্তিকে বিপর্যস্ত করে ব্রিটিশ সরকারের যুদ্ধ সংক্রান্ত উদ্যোগ সমূহকে অকেজো করে দেওয়া। আন্দোলনকারীদের উদ্দেশ্যে গোপনে বেতার কেন্দ্র থেকে

প্রচার চালানোর দায়িত্বে ছিলেন ঊষা মেহেতা। সরকারের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদী নাশকতা চালানোর দায়িত্বে ছিলেন শিক্ষিত তরুণরা যারা প্রায়শই গেরিলাযুদ্ধের কৌশল অবলম্বন করতেন। নেপাল-বিহার সীমান্ত বরাবর এই ধরনের গেরিলা যুদ্ধ পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন জয়প্রকাশ নারায়ণ। কৃষকদের বাহিনীও নাশকতামূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল যা 'কর্ণাটক পদ্ধতি' ('Karnatak method') নামে পরিচিত। কোন কোন স্থানে (যেমন মেদিনীপুরের তমলুক, মহারাষ্ট্রের সাঁতারা এবং ঊড়িষ্যার তালচের) জাতীয় সরকার গঠিত হয়েছিল।

সুগত বোস ও আয়েষা জালাল লিখেছেন ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দের ভারত ছাড়ো আন্দোলনের কৃষিগত দিকটি ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের মহাবিদ্রোহের মতো বহু শ্রেণি-বিন্যস্ত চরিত্রের। ছোট কৃষিক্ষেত্রের অধিকারী কৃষক শ্রেণিই এই প্রতিরোধ আন্দোলনের মেরুদণ্ড ছিল। এরাই বিদ্রোহে প্রধান ভূমিকা পালন করেছিল। পূর্ব উত্তরপ্রদেশ এবং বিহারে ভারত ছাড়ো আন্দোলন জোরদার হয়ে উঠেছিল কৃষকদের ব্যাপক অংশগ্রহণে। এখানে আন্দোলন প্রকৃতই গণবিদ্রোহের রূপ নিয়েছিল। আন্দোলনের ঝটিকা কেন্দ্র বিহারে বিভিন্ন জাতির চাষিরা এবং আদিবাসী জনগণ ব্যাপক অংশ নিয়েছিল। ঔপনিবেশিক নির্যাতনের প্রতীক থানাগুলির প্রায় ৮০% জনতার দখলে চলে গিয়েছিল। শ্বেতাঙ্গ শাসকদের বিরুদ্ধে তাদের ক্ষোভের প্রধান কারণ ছিল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় শ্রমিক হিসেবে গিয়ে অন্যায় শোষণ ও চূড়ান্ত বৈষম্যের শিকার হওয়া। তাছাড়া এই অঞ্চলের কৃষকরা ১৯৩০-এর দশকেই স্বামী সহজানন্দের নেতৃত্বে বিহার কিষাণ সভার অধীন সংগঠিত হয়েছিল। ভারত ছাড়ো আন্দোলনে কৃষকদের ভূমিকা সম্পর্কে সুমিত সরকার বলেছেন, "What made the August Movement so formidable, was the massive upsurge of peasents." এইসব কৃষকদের মধ্যে মধ্যবিত্ত ও প্রান্তিক কৃষক এবং ক্ষেতমজুর শ্রেণিও ছিল। ম্যাক্স হারকোর্ট (Max Harcort) বিহারের আন্দোলনকারীদের সামাজিক অবস্থান বিশ্লেষণ করে বলেছেন যে এই আন্দোলন ছিল মূলত কৃষক বিদ্রোহ – জাতীয় বিদ্রোহ নয় এবং নেতৃত্ব দিয়েছিল শহরের মধ্যবিত্ত মানুষ। স্টিফেন হেনিংহ্যাম অবশ্য মনে করেন বিহারে ভারত ছাড়ো আন্দোলনের দুটি প্রধান ধারা ছিল একটি মধ্যবিত্তদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং অন্যটি নিম্নবর্ণের মানুষের দ্বারা পরিচালিত। কংগ্রেস সমাজতন্ত্রীদের নেতৃত্বে এবং কৃষকদের অংশগ্রহণে এই আন্দোলন উগ্ররূপ নিয়েছিল।

আরেকটি বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা যেতে পারে — তা হল ভারত ছাড়ো আন্দোলন কি গান্ধিবাদী নীতি তথা অহিংসার আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়েছিল ? ভারত ছাড়ো আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ে যে নাশকতামূলক ও সন্ত্রাসবাদী ক্রিয়াকলাপ হয়েছিল তা গান্ধিজির অহিংস

ভাবমূর্তিকে ক্ষুণ্ণ করেছিল। সন্দেহ নেই আন্দোলন ভয়ঙ্কর হিংসাত্মক রূপ নিলেও গান্ধিজি আন্দোলন বন্ধ করেন নি। এই আন্দোলনে এমন কিছু ঘটনা ঘটেছিল (যেমন চৌকিদারদের গোয়েন্দা হিসাবে নির্যাতন কিংবা ধনী জোতদারদের কাছ থেকে জোর করে অর্থ আদায় ও ধনী ব্যক্তিদের জরিমানা করে অথবা অপহরণ করে অর্থ আদায় ইত্যাদি) যা গান্ধি আদর্শের সম্পূর্ণ বিরোধী। গান্ধিজি ব্যক্তিগতভাবে এইসব ঘটনা সমর্থন না করলেও তার উপর তাঁর কোন নিয়ন্ত্রণ ছিল না। সর্বত্র গান্ধিজির নামে আন্দোলন পরিচালিত হলেও গান্ধিজির সঙ্গে তার কোন যোগ ছিল না। তবে গান্ধিজি নিজে অহিংস আদর্শের প্রতি একনিষ্ঠ ছিলেন। কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দলের নেতা জয়প্রকাশ নারায়ণের সঙ্গে গান্ধিজির নানা বিষয় মতানৈক্য থাকা সত্ত্বেও তিনি তাঁর সম্পর্কে মন্তব্য করেন, "Gandhiji is in no event prepared to depart from non-violence. With him it is a question of live and death." বাস্তব পরিস্থিতি এমন হয়ে উঠেছিল যে তিনি আন্দোলনের প্রাণশক্তি হয়েও জনগণের ইচ্ছায় লাগাম চড়াতে পারেন নি। অধ্যাপক অমলেশ ত্রিপাঠী যথার্থভাবেই মন্তব্য করেছেন, "১৯৪২-এ ক্রিপস্ দৌত্যের ব্যর্থতার পর সারা দেশে যে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী মনোভাব প্রায় বিস্ফোরণের পর্যায় এসেছিল, ভারত ছাড়ো আন্দোলন তাকে একটা নিষ্কাষণের পথ করে দেয়। এখানে গান্ধী যতটা নেতা, ততটাই জনগণের ইচ্ছার দাস।"

— ০ —